Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৬ নভেম্বর, ২০২১

৪৪ বর্ষ ৪২ সংখ্যা ১৫ নভেম্বর, ২০২১, সোমবার, ২৮ কার্তিক, ১৪২৮

টিকা নিতে বাধা রুখে দিলেন রেড ভলেন্টিয়াররা

নিজস্ব সংবাদদাতা, রায়না, ১১ নভেম্বর : করোনা ভ্যাকসিন নিতে বাধা দিল তৃণমূলের নেতারা। এলাকায় এ নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়ায়। মাধবডিহি থানার কাইতি অঞ্চলের চকচন্দন, কেশবপুর, বৈঠারীসহ সংলগ্ন কয়েকটি গ্রামের প্রায় ১২৫ জন মানুষ দলমত নির্বিশেষে জড়ো হয়। রেড ভলেন্টিয়ার্স এর উদ্যোগে বর্ধমান শহরে এই মানুষদের করোনা ভ্যাকসিন নিতে যাওয়ার জন্য বাসসহ কয়েকটি যানবাহনের ব্যবস্থা করা হয়। ধান কাটার কাজ শুরু হওয়া সত্ত্বেও কাজ বন্ধ করে শ্রমজীবী বহু মানুষ যখন ১১ নভেম্বর সকালে বাসে উঠতে যায় তখন চকচন্দন গ্রামের কয়েকজন চিহ্নিত দুষ্কৃতী কাইতি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের নেতৃত্বে মানুষজনকে বাধা দেয়। রেড ভলেন্টিয়ার্স ওয়ারেস মোল্লার উপর নৃশংস হামলা চালায়। এলাকার মানুষ ভ্যাকসিন নেওয়ার ভালো কাজে বাধা দেওয়ায় ক্ষুব্ধ। দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষ এই বাধাদানের নিন্দা করে প্রশাসনের কাছে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন।

নিম্নচাপের বৃষ্টিতে পথে বসলো কৃষকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৪ নভেম্বর : অক্টোবর মাসে পরপর দুইবার নিম্নচাপের বৃষ্টিতে পেঁয়াজ বীজ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। পরে আবার নতুন করে বীজ ফেলে কৃষকরা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কৃষকদের সেই আশাও পূরণে বাধা হল নভেম্বরের নিম্নচাপ। লাগাতার নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টি কৃষকদের একেবারেই পথে বসিয়ে দিল বলে জানান—পূর্বস্থলী-১ পঞ্চায়েত সমিতির বগপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নওপাড়া গ্রামের কৃষক কিংশুক তা। পেঁয়াজ বীজের ক্ষতির কথা মেনে নিয়েছেন কালনা মহকুমা সহ কৃষি আধিকারিক ডঃ পার্থ ঘোষ। তিনি বলেন—এই নিম্নচাপের বৃষ্টি পেঁয়াজ বীজের ক্ষতি করবে। এই বীজ নষ্ট হয়ে গেলে পরবর্তীতে আর পেঁয়াজ বীজ ফেলার সময় পাবে না কৃষকরা। পূর্ব বর্ধমান জেলার কৃষিপ্রধান মহকুমাগুলির মধ্যে কালনা অন্যতম। নদীমাতৃক এই মহকুমায় মাটির প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন ফসলের চাষ হয়। প্রতিবছরই কালনা মহকুমার কমবেশি ৪ হাজার ৭৩০ হেক্টর জমিতে শীতকালীন সুখসাগর প্রজাতির পেঁয়াজ চাষ হয়। এই মহাকুমায় ব্লকওয়ারি পেঁয়াজ চাষ হয়—কালনা-১ ব্লক এক হাজার ১২০ হেক্টর, কালনা-২ : ৭০০ হেক্টর, পূর্বস্থলী-১ : ১ হাজার ৬০০ হেক্টর, পূর্বস্থলী-২ : ১ হাজার ৮০ হেক্টর এবং মন্তেশ্বর ১৫০ হেক্টর জমিতে। পূর্বস্থলী ১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত সমুদ্রগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের নিচু চাপাহাটি গ্রামে এক কৃষককে বীজতলা থেকে জল বের করতে দেখা গেল। তিনি জানান, বৃষ্টির জল পেঁয়াজ বীজ-এর কাছে বিষের মতো কাজ করে। জল পড়লেই গোড়া পচা শুরু হয়ে যায়। তবুও আশা না ছেড়ে তিনি চেষ্টা করছেন জল বের করে দিয়ে যদি কিছু চারা বাঁচানো যায়। তবে অভিজ্ঞতা হচ্ছে, বৃষ্টির জল পড়লেই পেঁয়াজ বীজ পচতে শুরু করে। ইতিমধ্যেই মাঠে মাঠে পেঁয়াজ রোপণের কাজ শুরু হয়ে গেছে। তাই আর নতুন করে বীজ ফেলার সময় পাওয়া যাবে না।

সিপিআই(এম) এরিয়া সম্মেলনে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াবার শপথ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৫ নভেম্বর : আগামী ২৫-২৬ ডিসেম্বর সিপিআই(এম) জেলা সম্মেলন হবে বর্ধমান শহরে। সিপিআই(এম) পলিটব্যুরো সদস্য নিরুপম সেন-এর নামে সম্মেলনের নামকরণ করা হয়েছে। উদয় সরকারের নামে মঞ্চের নামকরণ করা হয়েছে। একে সামনে রেখে জেলার এরিয়া সম্মেলনগুলি এলাকার মানুষের সাহায্যে হয়ে চলছে। বর্ধমান শহর এরিয়া-২ কমিটির সম্মেলন হবে টাউনহল মৃদুল সেন নগর ও দিলীপ দুবে মঞ্চে আগামী ১৮ নভেম্বর।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ভাতার-১ এরিয়া কমিটির দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৩ নভেম্বর ২০২১, স্বপ্না রায় নগর (ভাতার বাজার) ও প্রদীপ দত্ত মঞ্চে। সম্মেলন উদ্বোধন করেন পার্টি জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য গণেশ চৌধুরী। প্রতিবেদন পেশ করেন সম্পাদক সুভাষ মণ্ডল। রিপোর্টের উপর আলোচনা করেন ২২টি শাখা থেকে ২২ জন।

সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন পার্টি রাজ্য কমিটির সদস্য তথা জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক। সম্মেলনস্থলে উপস্থিত ছিলেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আভাস রায়চৌধুরী। সম্মেলন থেকে ১৩ জনের কমিটি ও ২ জন বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন মিজানুর রহমান মণ্ডল। সিপিআই(এম) বর্ধমান সদর এরিয়া-২ কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় চামারদিঘিতে। নবনির্বাচিত সম্পাদকের নাম মৃণাল কর্মকার। শাসকদলের সন্ত্রাস উপেক্ষা করে এলাকার মানুষ যুক্ত হয়েছে সম্মলনগুলিতে। প্রতিনিধিরা এলাকা ধরে ধরে দুর্বলতা চিহ্নিত করেছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের কারণগুলির চুলচেরা বিশ্লষণ করা হয় ও মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর শপথ নেওয়া হয়।

পেট্রোল-ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে অবস্থান-বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১২ নভেম্বর : মেমারি-১ পশ্চিম এরিয়া কমিটির উদ্যোগে ১২ নভেম্বর বিকেলে মেমারি চকদিঘী মোড়ে অবস্থান ও বিক্ষোভসভা হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। সেই কারণে দেশের প্রত্যেকটি পরিবার সংকটের মধ্যে পড়েছেন। দিল্লির রাজপথে কষকরা এক বছর ধরে লড়াই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। সেই লড়াইকে ভাঙার চেষ্টা করছে সরকার। ইতিমধ্যে ৭০০ কৃষক প্রাণ হারিয়েছেন। নারী নির্যাতন, শিশু মৃত্যু বন্ধ করতে হবে ও অবিলম্বে পৌরসভার নির্বাচন করতে হবে। এই কর্মসূচি ১৭ তারিখ পর্যন্ত চলবে। প্রতিবাদ জানিয়ে সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সমর ঘোষ। তিনি বলেন, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার একই মনোভাব নিয়ে চলছে! লাগাতার জ্বালানি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে, যার আঁচ পড়ছে সাধারণ মানুষের ঘরে! তিনি আরো বলেন, আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার রেশন ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গোটা রেশন ব্যাবস্থাটা তুলে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। করোনা পরিস্থিতিতে দিন-আনা দিন-খাওয়া মানুষগুলো যে সরকারি সহায়তার ওপর নির্ভর করে থাকত তা আর তারা পাবে না। সবকিছু জেনে বুঝেও চুপ রাজ্য সরকার। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার জ্বালানি তেলের উপর কর কিছুটা হ্রাস করলে ও রাজ্য সরকারের সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। তারা শুধুমাত্র তাদের রাজনীতির ফায়দা তুলতে ব্যস্ত! যার মূল্য চোকাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এভাবে যদি আগামী দিনে চলতে থাকে সে ক্ষেত্রে যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সাধারণ মানুষের মুখে অন্ন তুলে দিতে ব্যস্ত, তারাই সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে! তাই অবিলম্বে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে সম্মিলিতভাবে কৃষক ও সাধারণ মানুষের স্বার্থে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও জ্বালানির মূল্য নিয়ন্ত্রণ, ও কেন্দ্রীয় রেশন ব্যবস্থাকে সচল রাখার আবেদন জানানো হয় বামেদের পক্ষ থেকে। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জয়দেব ঘোষ, পিন্টু ভট্টাচার্য, কালু রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

শাসকের মদতে উচ্ছেদ হওয়া জমি পুনরুদ্ধার করলেন আদিবাসীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৪ নভেম্বর : বর্ধমান সদরের রায়ানের দুর্গাডাঙ্গা মৌজার প্রায় ৫ বিঘা জমি পুনুরুদ্ধার করলেন আদিবাসীরা। কৃষকসভার নেতৃত্বে তীর-ধনুক নিয়ে আদিবাসীরা শাসকদলের লেঠেল বাহিনীকে হটিয়ে পুনর্দখল করেন।

বামফ্রন্টের সময় পাট্টা পাওয়া জমি দুবছর আগে দখল করে নেয় জমি মাফিয়ারা। সেই জমি নিজের দখলে নেয় আদিবাসী মালিকরা। আদিবাসী নেতা মঙ্গল হেমব্রম জানান জল, জঙ্গল, জমির অধিকার জীবন দিয়ে রক্ষা করবো। সিধু, কানহু আমাদের এই অধিকার বুঝিয়ে দিয়েছেন।

১৩ নভেম্বর জমি-মাফিয়াদের হয়ে পুলিশ এলেও আদিবাসীদের মেজাজের সামনে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। তৃণমূল ক্ষমতায় এসে জেলার ২ হাজার বিঘা খাসজমি কেড়ে নেয়। গলসিতে প্রথম জমি পুনরুদ্ধার হয় কৃষকসভার নেতৃত্বে। এরপর সর্বত্র তার প্রভাব পড়েছে।

হাতির দলের হানায় পাকা ধানে মই

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১২ নভেম্বর : চারদিন হাতির হানায় প্রায় দু হাজার হেক্টর জমির ধান ক্ষতির মুখের গলসী, ও আউসগ্রাম ব্লক মিলিয়ে কতটা ক্ষতি তা হিসেব কষছে কৃষি দপ্তর। তাদের হিসেব অনুযায়ী গলসির ৪টি পঞ্চায়েত এবং আউশগ্রামের ৮টি পঞ্চায়েত মিলিয়ে চার হাজার চাষি ক্ষতিগ্রস্ত।

এবার চাষে একটানা দুর্যোগ, পরে বাদামি শোষকের আক্রমণ চাষির মুখে হাসি কেড়ে নিয়েছে। গোদের ওপর বিষফোঁড়া, হাতির হানা। একেবারে পাকা ধানে মই-এর সামিল। গলসীর চাষি শেখ আলমগীর জানান, ধান কাটার মাত্র পাঁচদিন আগে হাতির দল সব শেষ করে দিলো। ক্ষতিপূরণ তো বনদপ্তর দেবে শুনছি। সে তো নামমাত্র। তাছাড়া কবে পাওয়া যাবে তার নেই ঠিক। এ প্রসঙ্গে খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জানান, ক্ষতিপূরণের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বনদপ্তর সূত্রে জানা যায় প্রতি বিঘায় ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় ১৯৮০ টাকা। অথচ এবার বিঘা পিছু উৎপাদন খরচ ১৫-১৬ হাজার টাকা। এজন্য ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের বনদপ্তরের দেওয়া ফর্ম পূরণ করতে হবে।

১০ নভেম্বর রাতে দামোদর টপকে বাঁকুড়ার পাত্রসায়র থেকে গলসীতে ঢুকে পড়ে প্রায় ৫০টি হাতির দল। বনদপ্তর সূত্রে জানা যায় গত তিন দিনে গলসি আউসগ্রাম মিলিয়ে ৫৮ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে দলটি এখন আউশগ্রামের কুমারগঞ্জে অবস্থান করছে। তাদের বাঁকুড়ার জঙ্গলে পাঠাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে বনদপ্তরের কর্মীরা। এলাকার মানুষের প্রশ্ন, যথেষ্ট সময় পাওয়া সত্ত্বেও হাতির দলকে নিয়ন্ত্রণে আনা গেলো না কেন?

সবশেষ খবরে জানা গেছে এখনও হাতির দল তিনটি ভাগে ভাগ হয়ে আউশগ্রাম জঙ্গলে অবস্থান করছে। গত ১৩ নভেম্বর সারা রাত বৃষ্টির কারণে হল্লাপার্টি হাতিদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি বলে জানায় বনদপ্তর।

নতুন চিঠি

১৫ নভেম্বর, ২০২১

তাতে কী এসে যায়!

প্যারিস থেকে সামান্য এগিয়েই থেমে গেছে গ্লাসগোর পরিবেশ সম্মেলন। আলোচনায় ইতিবাচক কিছু না হওয়ায় হতাশ পরিবেশ কর্মীরা তৈরি করেছেন আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মেলনের নকল সমাধিক্ষেত্র। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব স্বয়ং গ্লাসগো সম্মেলনের জলবায়ু আলোচনাকে বলতে বাধ্য হয়েছেন 'আপসের চুক্তি'। তাতে কী এসে যায়? সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) ও এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট (ইডি)-র অধিকর্তাদের মেয়াদ বাড়াতে কেন্দ্রীয় সরকারকে জরুরি অর্ডিন্যান্স আনতে হয়েছে। তাতে কী এসে যায়? সরকারের জন্য সিবিআই না ইডি, নাকি সিবিআই-ইডির জন্য সরকার? এই প্রশ্ন কে করবে! বাধ্যতামূলক ডিজিটাল ক্লাসের চাপে কলকাতার সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটছে নজিরবিহীন ড্রপ আউট। 'ব্লেন্ডড মোড অব এডুকেশন'-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ বাধ্যতামূলক ডিজিটাল এবং ভাষার বিভাজন। তাতে কী এসে যায়? রাজ্যে মাইক্রোফিনান্সের ঋণের ফাঁদে নিরুপায় বিপর্যস্তরা চিঠি লিখেছেন দান-খয়রাতিতে ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রীকে। আত্মহত্যা করব, না গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাবো? দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সর্বশেষ রিপোর্টে রাজ্যে পর্ষদ অনুমোদিত শিল্প সংস্থার সংখ্যা যেখানে ছিল ৬১ হাজার সেখানে ২০২১ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ৩৯ হাজারে। গত পাঁচ বছরে চাষযোগ্য জমি কমেছে ৫৬ হাজার হেক্টর। ২০১১ সালে বামফ্রন্ট সরকারের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে এরাজ্যে শিল্পায়নের পর্বটিরও চির অবসান হয়ে গেছে। তাতে কী এসে যায়? মুখ্যমন্ত্রী এখন ব্যস্ত শিল্পের শ্মশানে লগ্নি উৎসবে।

পরিবেশ রক্ষার দায় ঝেড়ে ফেলার প্রতিবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১১ নভেম্বর : ধনী দেশগুলির পরিবেশ রক্ষায় দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলার প্রতিবাদে কালনায় প্রতিবাদ জানায় পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের কালনা বিজ্ঞান কেন্দ্র। বিভিন্ন স্লোগানের প্লাকার্ড গলায় ঝুলিয়ে নরকঙ্কাল নিয়ে প্রতিবাদে সরব হন বিজ্ঞানকর্মীরা। পথসভায় বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য আশুতোষ পাল, তাপসকুমার কার্ফা, অশোক মুখার্জী, অভিজিৎ দাস, সঞ্জিত ব্যানার্জি প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন সুব্রত সাহা। তাঁরা বলেন, ধনী দেশগুলো পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব পালন করেনি। উষ্ণায়ণ রোধে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তারা অর্থ বরাদ্দ করেনি। ২০১৫-র প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে ধনী দেশগুলো বিকল্প শক্তি ব্যবহারের প্রযুক্তি এবং অর্থ বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল উন্নয়নশীল বিশ্বকে। এই প্রতিশ্রুতি পালন করেনি তারা। প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে শিল্পায়নের আগের পর্বের তুলনায় উষ্ণায়ণ দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসে বেঁধে ফেলার লক্ষ্য জানানো হয়েছিল।

কিন্তু পরিস্থিতি অবনতির হওয়ার কারণে এখন ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে উষ্ণায়ণ বেঁধে রাখা আবশ্যক। বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব ইতিমধ্যেই টের পাওয়া যাচ্ছে সব দেশে। তা সত্ত্বেও পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ করে ধনী দেশগুলি একেবারেই সক্রিয় নয়। তাই মানব সভ্যতা একেবারে চরম বিপদের সম্মুখীন। এদিন নরকঙ্কাল নিয়ে এই কর্মসূচি করার কারণ হিসেবে জানানো হয়— পরিবেশ রক্ষা করতে না পারলে মানুষ এই ভাবেই কঙ্কালে পরিণত হবে। বাঁচার কোন উপায় নেই।

কুমির আতঙ্কে পূর্বস্থলীর মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১৩ নভেম্বর : মুর্শিদাবাদ জেলার পর বেশ কয়েকদিন ধরে কুমির আতঙ্কে ভুগছেন পূর্বস্থলীর মানুষ। বেশ কিছুদিন আগে মুর্শিদাবাদ জেলার একটি ঘাটে প্রথম দেখা মেলে একটি কুমিরের। তারপরে এই জেলার বিভিন্ন স্থানে কুমিরটিকে দেখা যায়। তারপরেই গত ৯ নভেম্বর পূর্বস্থলীর পিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শিমুলডাঙ্গা ঘাটে কুমিরের দেখা মেলে। তারপর থেকেই পূর্বস্থলী থানার পাটুলি স্পোর্টিং ক্লাবের ঘাটে, নিমদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের যজ্ঞেশ্বরপুর প্রভৃতি ঘাটে তার দেখা মিলেছে। ফলে পূর্বস্থলীর মানুষের মনে বিরাট কুমির আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই পূর্বস্থলীর বিভিন্ন পঞ্চায়েত থেকে মানুষকে সচেতন করার জন্য প্রচার অভিযান চালানো বন্ধ হয়েছে। ভাগীরথী নদীতে স্নান করা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন মানুষজন। বনদপ্তরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে এসে শুধু শুনিয়ে যাচ্ছেন কুমিরটির উপর লক্ষ্য রাখা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ থেকে পূর্বস্থলী কোথাও কুমিরের আক্রমণ হয়েছে বলে শোনা যায়নি এখনো পর্যন্ত। এখন দেখার, ভাগীরথী নদীপারের মানুষের কুমির আতঙ্ক কবে কাটে।

বাজার ও দরিদ্র মানুষ ঃ পরস্পরের শত্রু না সহায়ক শক্তি?

শান্তনু কুমার ঘোষ

দশম পর্ব

প্রাকৃতিক মূলধন—চীনের কৃষি ব্যবস্থা :

জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক মূলধন সংক্রান্ত আলোচনার শুরুতে (পঞ্চম পর্ব) আমরা দেখেছিলাম যে কৃষি ও খামার সংক্রান্ত কাজের দরুন প্রকৃতির উপর প্রভাব আর্থিক অংকে কৃষি/খামার থেকে প্রাপ্ত মোট আয়ের ৭১০ শতাংশ। আবার ভারতের ক্ষেত্রে মোট প্রাকৃতিক মূলধন জনিত ব্যয়ের (ব্যাঙ্ক ঋণের পরিপ্রেক্ষিতে) ৮৩ শতাংশের জন্য দায়ী কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প। প্রথম তথ্য অনুযায়ী কৃষিব্যবস্থা অলাভজনক তো বটেই, বরং অত্যন্ত আর্থিক ক্ষতির কারণ। অন্যদিকে, ভারতের ব্যাঙ্কব্যবস্থা অলাভজনক কৃষিক্ষেত্রে প্রভূত পরিমাণে ঋণ দান করার দরুন অনাদায়ী ঋণের ফান্দে জড়িয়ে পড়ার প্রভূত সম্ভাবনা। অতএব জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা সমাধান করা হল পূর্বোক্ত সমস্যা থেকে নিস্তার পাওয়ার প্রধান পথ এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযুক্ত সহায়ক কৃষি ব্যবস্থা অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। বর্তমান পর্বে আমরা চীন-অনুসৃত কৃষি-ব্যবস্থার পর্যালোচনার মাধ্যমে এই বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করব।

লন্ডন শহরে অবস্থিত International Institute for Environment and Development ২০১৫ সালে চীনের কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কে একটি গবেষণাধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রচলিত কৃষিব্যবস্থা জনিত সমস্যা থেকে মুক্ত হবার উদ্দেশ্যে চীন যে নির্ভরযোগ্য ও স্থিতিশীল বহুমুখী উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মিশ্র পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করে-সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায় এই প্রতিবেদনটি থেকে।

প্রচলিত কৃষিব্যবস্থা হতে উদ্ভূত সমস্যা চীন ও ভারত সহ সমস্ত দেশের ক্ষেত্রে প্রায় একই রকম—১) ভূমি ক্ষয়, ২) ভূগর্ভস্থ জলের অপরিমিত ব্যবহারের দরুন দেশের নানান অংশে জলাভাব, এবং ৩) অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের দরুন নাগরিকদের স্বাস্থ্যহানি, ভূমির উৎপাদনশীলতার উপর ক্ষতিকারক প্রভাব এবং কৃষিজাত দ্রব্যের আন্তর্জাতিক বাজারে গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস।

চীনের ক্ষেত্রে এখানেই সমস্যার শেষ নয়। একদিকে কৃষিক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান ও অনিশ্চিত আয় এবং অন্যদিকে দ্রুত বেড়ে চলা নগরায়ণ—এই দুইয়ের সম্মিলিত প্রভাব এবং অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হাতছানি গ্রামের মানুষকে শহরমুখী করে তোলে। এর ফল হল যথেষ্ট সংখ্যায় কৃষি-শ্রমিকের অভাব। ক্রমবর্ধমান নগরায়নের ফলে এই শতাব্দীর প্রথম দশ বছরে চিনে গ্রামের সংখ্যা প্রায় ৩.৬ মিলিয়ন থেকে কমে দাঁড়ায় ২.৭ মিলিয়ন; অর্থাৎ মাত্র দশ বছরে নয় লক্ষ গ্রাম বিলুপ্ত হয়। সেই সঙ্গে গ্রামে বসবাসকারী জনসংখ্যার অধিকাংশই হয় মহিলা অথবা বৃদ্ধ। অথচ প্রচলিত কৃষিব্যবস্থা মূলত শ্রম-নির্ভর। স্বভাবতই, এই সমস্যা সমাধানে চাই যথোপযুক্ত পরিকল্পনা রচনা ও তার প্রয়োগ। চীন সরকার সেই উদ্দেশ্যে দেশের নানান প্রান্তে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন কৃষিপদ্ধতি রূপায়ণের চেষ্টা করে-যার মূল নির্ধারক শক্তি হল প্রাকৃতিক মূলধন, মানবিক মূলধন, কৃৎ-কৌশল এবং বাজার। আলোচনার পরবর্তী স্তরে আমরা সেই সমস্ত পদ্ধতির উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করবো।

বিখ্যাত কৃষিবিজ্ঞানীদের মতে চীন অনুসৃত কালাতিক্রম্য কৃষি (Sustainable agriculture) উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তিটি খুবই সুদৃঢ়, এবং সেটা সম্ভব হয়েছে সেদেশের হাজার হাজার বছরের পুরাতন প্রচলিত কৃষিব্যবস্থার সুবাদে। আমেরিকান কৃষি-অর্থনীতিবিদ, F.H. King তাঁর ২০১০ সালে প্রকাশিত 'Farmers of Forty Centuries- Permanent Agriculture in China– Korea and Japan' বইটিতে দেখিয়েছেন যে সহস্র বর্ষেরও বেশি প্রাচীন চৈনিক কৃষিব্যবস্থা এতটাই বিজ্ঞানসম্মত ছিল যে তা শুধু স্বাস্থ্যকর খাদ্যশস্য উপহার দিয়েই ক্ষান্ত ছিল না, বরং দীর্ঘকাল ধরে ভূমির উৎপাদনশীলতাও বজায় রেখেছিল বা বৃদ্ধি করেছিল।

তাহলে সেদেশের কৃষিক্ষেত্রে এতটা সমস্যার সম্মুখীন কেন? মনে রাখতে হবে যে, বিপ্লবোত্তর চিনের অন্যতম প্রধান সমস্যা ছিল অর্থনীতির উপর বিপুল জনসংখ্যার চাপ। এবং সেই সঙ্গে আধুনিক শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ও পরবর্তীকালে কৃষিব্যবস্থার আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া—এক ধরনের বাধ্যতামূলক পরিবেশের সৃষ্টি করেছিলো। তারই ফলস্বরূপ প্রচলিত কৃষিব্যবস্থা ক্রমশ প্রকৃতি ও মানুষের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বর্তমানে বিশ্বের মোট গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণের প্রায় ২৪ শতাংশের অবদান একা চীনের। এমনই এক পরিস্থিতিতে আশির দশকে চীন সরকার নানান কালাতিক্রম্য কৃষিব্যবস্থার প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, এর মধ্যে দুটি ধারণা অপেক্ষাকৃত বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সেগুলি হলঃ পরিবেশগত কৃষি (Ecological agriculture) এবং বৃত্তাকার কৃষি (Circular agriculture)।

পরিবেশগত কৃষির দুটি ভিন্ন রূপ চীনে দেখা যায়ঃ (১) উল্লম্ব রোপণ (vertical planting) পদ্ধতি ও কীটপতঙ্গের হাত থেকে রক্ষার জন্য জৈব নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহার। সেই সঙ্গে দেশ জুড়ে বাড়ির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সব্জি ও ফল চাষ এবং পশুপালন ব্যবস্থার প্রবর্তন। (২) দেশের পশ্চিম অংশে কৃষিতে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার হলেও উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য হল জমির উর্বরতা এবং ভূমি ও জল দূষণ মুক্ত একটি ব্যবস্থার প্রবর্তন। এই দুই ব্যবস্থার সমন্বয়ের ফলে একদিকে যেমন বিপুল খাদ্যশস্যের সরবরাহ ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয়নি, তেমনই অন্য দিকে দাবি করা হয়, ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বজায় রাখা ও দূষণ মুক্ত কৃষি উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

বৃত্তাকার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হল উৎপাদনের উপাদান ও শক্তি সম্পদের পুনঃ-পুনঃ ব্যবহার। এর ফলে যেমন দূষণ সৃষ্টিকারী উপাদান তথা বর্জ্যের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব, তেমনই এই ব্যবস্থার আর এক উল্লেখযোগ্য অবদান হল ভূমি ও জলের দূষণ হ্রাস করা। চিন সরকারের উদ্যোগে ১৯৮০ সাল থেকে পরিবেশগত কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন শুরু হলেও, বৃত্তাকার কৃষির প্রচলন হয় ২০০৬ সালে।

চৈনিক আধুনিক কৃষিব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য হল—পরিবেশ সুরক্ষা এবং খাদ্য-নিরাপত্তা। এই উদ্দেশ্য দুটিকে সফল করার জন্য তারা তিনটি গুণ নির্ধারক মান (standard) যথা-'জৈব' (১৯৯৪, ২০০৫), 'সবুজ' (১৯৯০) এবং 'ঝুঁকি বর্জিত'(২০০১) প্রবর্তন করে।

চীনের মতো জনবহুল দেশে নাগরিকের জন্য খাদ্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার কাজটি যে যথেষ্ট কঠিন তা বলাই বাহুল্য। বিশেষত, সেদেশের কৃষিযোগ্য জমি প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কম। ২০১৬ সাল নাগাদ ভারতের কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ যখন প্রায় ১৬০ মিলিয়ন হেক্টর, তখন চীনের কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ ১২০ মিলিয়ন হেক্টর। অথচ সেই একই সময়ে চিনে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ভারতের নিরিখে প্রায় দ্বিগুণের বেশি। এর কারণ হল—ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদনশীলতা যেখানে হেক্টরপ্রতি গড়ে ৩০০০ কেজি, সেখানে চীনের উৎপাদনশীলতা হেক্টর -প্রতি প্রায় ৬০০০ কেজি। অর্থাৎ চীন খাদ্য নিরাপত্তার প্রয়োজনকে পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বাধা হিসাবে গণ্য না করে উপযুক্ত পরিকল্পনা রচনা ও তার প্রয়োগের জন্য চেষ্টা করেছে।

কেমন সেই পরিকল্পনা? আগেই বলা হয়েছে যে তারা তিনটি গুণ-নির্ধারক মান ব্যবহার করে। 'জৈব' মানের ক্ষেত্রে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অন্যদিকে 'সবুজ' মানের ক্ষেত্রে খুবই নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা যায়। 'ঝুঁকি বর্জিত' মানের ক্ষেত্রে অবশ্য এইগুলির ব্যবহার তুলনায় কিছুটা বেশি। কিন্তু এভাবে নানান মাত্রায় রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের কথা ভারতে কি ভাবা গেছে? চিনে এই কাজটি নিয়ন্ত্রণ করে সরকারি দপ্তর এবং 'জৈব' পণ্যের ক্ষেত্রে তৃতীয় কোনো সংস্থা। এক্ষেত্রে মূল কাজ হল উৎপাদিত পণ্যের মান সম্পর্কে শংসাপত্র প্রদান। একাজ অত্যন্ত জরুরি, কেননা শস্য উৎপাদনের মুখ্য চালিকা শক্তি হল বাজারের চাহিদা। অর্থাৎ দেশে উৎপাদিত কৃষি-পণ্যের গুণগত মানের নিদর্শক হিসাবে সরকারের/অনুমোদিত সংস্থার থেকে পাওয়া শংসাপত্র থাকা জরুরি। কারণ 'সবুজ' এবং 'ঝুঁকি বর্জিত' শ্রেণির পণ্যের বাজারের মুখ্য নিয়ন্ত্রক হল সরকার। তাই উপযুক্ত শংসাপত্র তথা ছাড়পত্র ছাড়া শস্য বিপণন অসম্ভব। এর আরও একটি কারণ হল যে 'ঝুঁকি বর্জিত' শংসাপত্র সম্বলিত শস্য দেশীয় বাজারের জন্য হলেও, অন্য দুটির ক্ষেত্রে উৎপাদিত শস্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও ব্যবহৃত হয়।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও, চীনের কৃষি পণ্য উৎপাদনে রাসায়নিক সারের ব্যবহার ভারতের তুলনায় অনেক বেশি, প্রায় দ্বিগুণ। এবং তার ফলে, সেদেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা দূষণমুক্ত এবং অন্তত ভারতের তুলনায় বেশি নির্ভরযোগ্য এমনটা দাবি করা হয়ত সঙ্গত হবে না। একমাত্র উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম।

(চলবে)

কৃষিসংকট ও সমবায়

দেবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

কৃষির সংকট আজ সামাজিক সংকটের চেহারা নিয়েছে। জমির অধিকার হারানোর সংকটের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ না থেকে জীবন জীবিকা এমনকি উৎপাদনশীলতা হারানোয় পর্যবসিত হয়েছে। কৃষক ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না। ফসল বিক্রি হচ্ছে না। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের অর্থ পাচ্ছে না। সরকারি ব্যবস্থাপনায় সকল কৃষকের শস্যবীমার ব্যবস্থা নেই। সার, বীজ, কীটনাশক, কৃষি যন্ত্রপাতির দাম ক্রমাগত বাড়ছে। এসবে রয়েছে বহুজাতিকের দাপট। সরকার দর্শক। ঋণের বাজারে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও মহাজনের দাপট বাড়ছে। ঋণশোধে ব্যর্থ কৃষক আত্মহত্যায় বাধ্য হচ্ছে। বড় রাজ্যগুলি আত্মহত্যার মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করছে। দেশে তিন লাখ কৃষক আত্মহত্যা করেছে (১৯৯৫-২৯১৭)। আমাদের রাজ্য সরকার একজনের আত্মহত্যাও স্বীকার করেনি, যদিও বর্তমান সরকারের শাসনকালে ২১৯ জন আত্মহত্যা করেছে।

ভারত সরকারের নতুন তিনটি কৃষি আইনের একটি প্রণয়ন করা হয়েছে চুক্তিচাষের উদ্যেশ্যে। সরকারি দায় দায়িত্ব কৃষিক্ষেত্র থেকে ঝেড়ে ফেলা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ও বহুজাতিকের লাভালাভের জন্য আইন তৈরি হয়েছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে কৃষি উৎপাদন ও পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনের কাজে যুক্ত করার পথ চুক্তিচাষ। এতে আগে থেকে নির্ধারণ করা দামে কৃষকের ফসল কিনে নেবার কথা উল্লেখ থাকে। নির্দিষ্ট গুণমান ও প্রয়োজনমত ফসল উৎপাদন কৃষককে করতেই হবে। এই বাধ্যবাধকতা কৃষকের থাকবে। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেট সংস্থা বীজ, সার, কীটনাশক ও কৃষি যন্ত্রপাতির যোগান দেবে কৃষককে। ২০০২ সালে পাঞ্জাবে চুক্তিচাষ শুরু হয়। পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে কোম্পানিসমূহ প্রতিশ্রুতিমতো ফসল কিনছে না। নিম্নমানের কৃষি উপকরণ সরবরাহ করছে। কৃষক ফসল বিক্রির দাম দেরিতে পাচ্ছে। আমেদাবাদ আই আই এম-এর অধ্যাপক শুকপাল সিং এই মত প্রকাশ করেছেন যে, চুক্তি চাষ শুধু কোম্পানির স্বার্থ দেখে। অর্থাৎ সরকার হয় অসহায় অথবা কোম্পানির দাসত্ব করতে বাধ্য।

আমাদের রাজ্য সরকার শুধুমাত্র নামে বিরোধিতা করেছে। চুক্তিচাষ না বলে এই পদ্ধতিকে অংশগ্রহণ-ভিত্তিক চাষ বলতে চাওয়া হচ্ছে। আমাদের রাজ্যে দুই চব্বিশ পরগণার ও পূর্ব বর্ধমানের কয়েকটি জায়গায় চুক্তিচাষ শুরু হয়েছে। পেপসি আলু চাষে উৎপাদন উপকরণ ও প্রযুক্তি সরবরাহ করছে। কৃষক ৫০ কেজি ফসল পিছু পাচ্ছে ৪৫০ টাকা। ওই পরিমাণ আলু থেকে চিপস্ জাতীয় পণ্য উৎপাদন করে পুঁজিপতি মুনাফা অর্জন করছে চাষিকে দেয় অর্থের প্রায় ৮ গুণ। অন্য রাজ্যের ধান এই রাজ্য সরকার কিনছে। কৃষক ধান বিক্রি করতে পারছে না। দুষ্টচক্র কাজ করছে ধান বিক্রির বাজারে। কৃষকবন্ধুর টাকার একটা বড় অংশ পাচ্ছে এলাকায় গড়হাজির জমির মালিক। বেসরকারি ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপ্তি বাড়ছে। রাজ্যের চাষি কৃষি-সংকটের আবর্তে বাধ্য হচ্ছে চুক্তি চাষে। আমন ও বোরোতে চুক্তিচাষের বাজার প্রসারিত হচ্ছে। একদিকে কর্পোরেট কৃষি অন্য দিকে বেসরকারি ঋণদাতা চক্রের প্রসারিত কর্মধারায় বাংলার কৃষক সর্বনাশের কিনারায়। ঋণের দুষ্টচক্রের শিকার কৃষকরা। দুই সরকারের একই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি— প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ও সরকারি অর্থসাহায্য ক্রমান্বয়ে কমিয়ে কৃষিকে বেসরকারি পুঁজির মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত করা।

দেশের ৭০ শতাংশ পরিবার এখনও কৃষি নির্ভর। এদের মধ্যে ৮২ শতাংশ ছোট ও মাঝারি কৃষক। কৃষকের ঋণগ্রস্ততা কমানো ও কৃষির সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণদানের পরিধি বাড়াতে হবে। তাই কৃষিসঙ্কট কাটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে সমবায়।

সমবায় হলো এমন এক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যেখানে মানুষ নিজের সামাজিক অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে স্বেচ্ছায় সমতার ভিত্তিতে একই ভাবনায় কাজ করে। এখানে সদস্যগণই দাতা, তারাই গ্রহীতা, তারাই ক্রেতা, তারাই বিক্রেতা ও মুনাফা ভোগের অধিকারী। শোষণ ও বঞ্চনা প্রতিরোধে সমবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বর্তমানের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার সময়ে দেশে ও রাজ্যে গ্রাম ও পৌর উন্নয়নে সমবায়ের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

সমবায় সমিতির প্রতি সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি উদার ও উন্নয়নে কল্যাণকামী হওয়া প্রয়োজন। সমবায় সমিতির ব্যবসা বাড়লে আয় বাড়বে ও আয় বাড়লে গরিব মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নতি হবে। সরকার সমিতিকে আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা করে সমিতির পুঁজি বৃদ্ধি করলে সমিতি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সফল হবে। আবার সমিতি তার সদস্যদের নয়া কৃষি প্রকৌশল ও ব্যবসা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে উদ্যোগ না-নিলে ও ব্যবস্থা না-করলে সমিতির কার্যকুশলতা বাড়বে না ও প্রতিযোগিতার বাজারে নিজেকে দক্ষ করে তুলতে পারবে না। দক্ষতা বৃদ্ধি অপরিহার্য। গণতান্ত্রিক কাজের ধারা ছাড়া সমবায় শক্তিশালী হয় না। এজন্য প্রয়োজন নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা সমিতি পরিচালনা। নিয়ম মানার জন্য ও কৌশলের সাহায্যে সমিতির পরিচালকমণ্ডলী গঠন করলে সমিতি তার কুশলতা হারাবে। গণতান্ত্রিক চরিত্র ও আর্থিক ক্ষমতা থাকলে সামাজিক একীকরণ, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য দূরীকরণে সমবায় কার্যকরী অবদান রাখবে। এছাড়া সমবায় সমিতি গঠন করে গ্রামীণ জনসমাজ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে। ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ে, প্রান্তিক মানুষের বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত হয়। অগ্রগতি ঘটে সামাজিক মিলনের ও একীকরণের। এসবের দ্বারা দারিদ্র্য কমে ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটে। আবার সমিতির গণতান্ত্রিক চরিত্র ও আর্থিক ভিত্তি থাকায় ও দারিদ্র্য দূরীকরণে ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে যথেষ্ট অবদান থাকায় আঞ্চলিক অর্থনৈতিক চক্রকে ভারসাম্যে রাখে। এটি প্রকারান্তরে অর্থনীতিকে সাহায্য করে। অর্থনৈতিক প্রগতি বাড়াতে পারে সমবায়। সমিতি সদস্যদের এই ধারণা দিতে পারে যে তারা আর্থিকভাবে স্বাধীন ও অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণে তারা দায়িত্ববদ্ধ।

সমবায়ের অপরিশোধিত ঋণের সুদ কয়েক বছরের জন্য মকুব করা দরকার। দরকার ঋণের যোগান অব্যাহত রাখা। এটি পারে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান। আঞ্চলিক ভিত্তিতে সমবায় গঠনে, সমবায়ের মালিকানায় পর্যাপ্ত হিমঘর তৈরি, আঞ্চলিক ভিত্তিতে কৃষিনির্ভর শিল্প গঠনে ও কৃষকদের কৃষিজ উৎপাদনের বীমাকরণে সরকারকে অগ্রগামী ভূমিকা নিতে হবে। বাজারি শক্তির কাছে কৃষিকে ছাড়লে সামাজিক সংকটের সমাধান হবে না।

বহুজাতিক কোম্পানিনির্ভর সার-বীজ-কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে জৈব সার ও আঞ্চলিক উকরণের ব্যবহার বাড়ানোর দিকে জোর দেওয়া প্রয়োজন। বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে এর উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। 'আত্মনির্ভরশীল ভারত' শ্লোগান হিসাবে না রেখে প্রকৃত আত্মনির্ভরশীল কৃষি-অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হতে হবে। সর্বোপরি সমবায় ও কৃষক উৎপাদনগোষ্ঠী তৈরি করে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা প্রয়োজন।

ভুয়ো বিদ্যুৎ কর্মী গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৭ নভেম্বর : মিটার রিডিং নেওয়ার অজুহাতে প্রতি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বকেয়া বিলের টাকা চাইতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় এক ভুয়ো বিদ্যুৎকর্মী। তাকে নাদনঘাট থানার পুলিশের হাতে তুলে দিলে রবিবার ধৃতকে কালনা মহাকুমা আদালতে পাঠানো হয়। আবেদনের ভিত্তিতে বিচারক তাকে চারদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনাটি ঘটে শনিবার বিকালে সমুদ্রগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীতলায়। দীপক রাজবংশী নামের এক ব্যক্তি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মিটার রিডিং নিতে শুরু করে। বকেয়া বিলের গ্রাহকদের থেকে সে টাকা চায়, না হলে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করার হুমকি দেয়। কিছু মানুষের সন্দেহ হলে তারা বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের খবর দেন। বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা এসে বলেন, এইরকম কর্মী দপ্তরের নয়। তখন পুলিশের হাতে তাকে তুলে দেওয়া হয়। ধৃত পুলিশকে জানায় তার নাম দীপক রাজবংশী, বাড়ি নৈহাটিতে।

জীবনের সন্ধানে হাঁটতেই হবে

ড. বিশ্বম্ভর মণ্ডল

গভীর খাদের মধ্যে পড়ে যাবার পরিস্থিতির মধ্যেও যারা বাঁচার সম্ভাবনাকে ব্যবহার করতে পারেন, তাদের সকলেই না হলেও অনেকেই বেঁচে ফিরে এসেছেন এমন অভিজ্ঞতার গল্প আমাদের কারুর না কারুর ঝুলিতে আছে। পাহাড়ের প্রতি বাঁকে মৃত্যুর হাতছানি আছে জেনেও যারা পাহাড় ভালোবাসেন, তাঁরা পাহাড়ের পথে পথে হেঁটেই চলেছেন। ঠিক তেমনি জীবনের হাজারো প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জীবন থেকে পালাবার কথা ভাবেনই না অধিকাংশ মানুষ। জন্মগ্রহণ করি মৃত্যু পরোয়ানা নিয়েই জেনেও মৃত্যুর মুখোমুখি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে যায় মানুষ। তাইতো অতিমারি কোবিদ পরিস্থিতিতে অজস্র মৃত্যু-সংবাদের মধ্যেও বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন প্রায় সকলেই। এই পৃথিবীতে কেউ কেউ মরে বেঁচে যায়- কারণ তাঁরা বেঁচে থাকতে সুখের আর আনন্দের সন্ধান পায় না, অবহেলা-অপমান-অনাদর যাদের জীবনের নিত্যসঙ্গী। আবার দীর্ঘ রোগভোগে বা যন্ত্রণাদায়ক রোগে দীর্ঘ লড়াইয়ের শেষে বা প্রতিদিন খাবার জোটাতে না পেরে বা নিয়মিত অপমানজনক বা ভালোবাসাহীন জীবনের শেষে—অনেকসময় আপনজনকেও বলতে শোনা যায় 'মুক্তি পেল'। একবিংশ শতকের সমাজেও প্রায় সব দেশেই অধিকাংশ মানুষকে যে জীবনযাপনটা করতে হয়, সেটা মোটেও সুখের বা সম্মানের জীবন না। বরং বলা যায় এ যেন বাঁচতে হয় তাই বেঁচে থাকা। বা আদৌ সেটা বেঁচে থাকা কিনা তা নিয়েও কথা বলার অবকাশ আছে। এদের মধ্যে মেয়েদের অবস্থা আরো খারাপ। কোবিদ পরিস্থিতিতেও লিঙ্গ বৈষম্য থেমে তো নেইই, বরং তা উত্তরোত্তর বাড়ছে। পৃথিবীতে ''বর্তমান যুগেও 'আধুনিক দাসত্বের' শিকার প্রায় ২.৯ কোটি মহিলা শ্রমিক, বলপূর্বক বিবাহ, বন্ডেড লেবার, যৌন কর্মী হিসাবেই এর মধ্যে বেশিরভাগ মহিলাকে ব্যবহার করা হচ্ছে একাধিক দেশে।''[১]

যদিও বেঁচে থাকার অর্থ এক-এক জনের কাছে এক-এক রকম। এটা জীবনটাকে কে কেমন ভাবে নিচ্ছেন তার ওপরেও নির্ভর করে । 'ভাববাদী' দর্শনে বিশ্বাসীরা বলবেন 'যার যা ভাগ্যে আছে তা হবেই'। 'বস্তুবাদী' দর্শনে বিশ্বাসীরা এটা কখনোই মানবেন না। তাঁরা জগত ও জীবনকে অধিকাংশ মানুষের পক্ষে 'বদল'-এর জন্যে লড়ার কথা বলবেন। তাই অনেকেই যেটাকে বেঁচে থাকা ভাবেন, আর এক দলের চোখে সেই বেঁচে থাকাটা অর্থহীন মনে হতেই পারে। নীচতা, হীনতা, ক্ষুদ্রতা, ঈর্ষা, হিংসা, প্রতিনিয়ত মিথ্যার বেসাতি করে বেঁচে থাকার মধ্যে যারা স্বর্গসুখ খুঁজে পান তাদের কথা আলাদা। যারা বঞ্চিত-লাঞ্ছিত মানুষকে বাঁচতে সাহায্য করে না, ন্যূনতম দায়িত্ব পালন না করেও মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের কানভারী করে বেড়ায়, তাদের কথাও আলাদা। আবার কেউ বেঁচেও মরে থাকে। একই সাথে বড়ো হওয়া মানুষের অকালমৃত্যুতেও যারা দীপাবলীর আলোয় নিজেদের আলোকিত রাখতে দ্বিধা করে না, সেই মহান মানুষেরাও আলোচনার বাইরে থাকুন। এর বাইরে আরো অনেক মানুষ আছেন যাঁরা প্রচারের আলো পান বা না-পান, প্রান্তিক মানুষের জন্যে তাঁদের কমিটমেন্ট অন্যরা বুঝুক বা না-বুঝুক, তাঁরা আর কিছু পারুন বা না-পারুন—যার যতটুকু শক্তি আছে সবটুকু নিয়ে তারা প্রান্তিক মানুষের পাশে থাকবেন এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। এই সময়ে এবং জীবনের সব বাধার সামনে সব সময়েই প্রান্তিক মানুষের লড়াইয়ের বর্ম হয়ে ওঠাটাই এদের মতো মানুষের কাছে বেঁচে থাকা। অসুস্থ সহনাগরিককে চিকিৎসায় সাহায্য এগিয়ে দেবার প্রয়োজনে, এমনকি মৃতদেহের সামনেও, নিস্পৃহ আচরণ দেখার অভিজ্ঞতা যেমন এই অতিমারিতে হয়েছে, অন্যদিকে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও মানুষের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা গেছে একদল মানুষকে। এদের মতো মানুষরাই মাথা উঁচু করে বলতে পারেন—'মানুষকে আমরা কোনদিন ঠকাইনি। তাই কেউ বলতে পারবে না আমরা কারুর সাথে কখনো বেইমানি করেছি। আমাদের আড়ালে যারা কুৎসা করে, সেটা তাদের ক্ষুদ্রতা, তাদের সমস্যা, তাদের শ্রেণিস্বার্থ।' এই চরম অরাজক পরিস্থিতির মধ্যেও অভিজ্ঞতার উপলব্ধি থেকে মানুষ বলতেই পারেন, 'এক শূন্যতা তৈরি হয়েছে। তোমাদের কাজ, তোমাদের কলম আর শুভানুধ্যায়ীদের নিয়েই মানুষের জন্যে লড়াই আবার শুরু করতে হবে'। সাধারণ মানুষই সাহস দিচ্ছেন—''এই ভার বহন করার শক্তি যেন তোমরা পাও। তোমরা ঠিক সামলাতে পারবে।'' মানুষই মনে করিয়ে দেবেন 'জীবন শুরু করেছো মৃত্যু দিয়ে। তোমাদের কে টলায়'? রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে অজস্রবার প্রিয়জনের মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। বারবার ধাক্কা খেয়েছেন, কখনো বা ধাক্কা সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। কিন্তু আবার জীবনকে আলিঙ্গন করেছেন। কাজের মধ্যেই তিনি জীবনকে খুঁজে নিয়েছেন। যারা বেঁচে রইলেন তাদের জীবনকে অর্থবহ রাখার জন্যে সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেছেন। যুগে যুগে কিছু মানুষ থেকে যাবেনই বৃহত্তর মানবসমাজের কল্যাণের কাজ থেকে যাদের এক মুহূর্তের জন্যে থামিয়ে রাখা যাবে না। মৃতু মিছিলের চলমানতাতে থমকে গেলেও কাজের প্রতি, আদর্শের প্রতি অঙ্গীকার থেকে এরা পাশে থাকবেন মানুষের। মৃত্যু দেখার অভ্যাস অনেক মানুষের চেতনাকে নিস্তব্ধ করে দিলেও আদর্শের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ মানুষগুলো থেকে যাবেনই। যদিও তা এদের কাছে কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা তো নয়ই, বরং বলা যায় সেটাই স্বাভাবিক এবং মানবসভ্যতার ইতিহাসে সেটাই বারবার ঘটেছে। বৃহত্তর মানবসমাজের স্বার্থে নিজের জীবনকে এরা অতীতেও বিলিয়ে দিয়েছিলেন, ভবিষ্যতেও দেবেন।

সূত্র ঃ

১) জয়দীপ দাস, কালান্তর, কলকাতা, ৫৫ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ১৩ নভেম্বর, ২০২১, পৃ-৩।

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, বাণিজ্য বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

এস.বি.আই অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৫ নভেম্বর : এস.বি.আই অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন (বেঙ্গল সার্কেল) এ. জেড. সি. বর্ধমান মডিউল-এর উদ্যোগে রশ্মি ব্লাড সেন্টার-এর সহযোগিতায় এস.বি.আই বর্ধমান শাখায় ৭৬তম স্বেচ্ছায় রক্ত দান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এই শিবিরে দুই দফায় ২৭ জন মহিলা সহ মোট ১০০ জন ব্যক্তি রক্ত দান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এস.বি.আই অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন (বেঙ্গল সার্কেল)-এর সহ সভাপতি সবুজ মিস্ত্রি, সার্কেল কোষাধ্যক্ষ দীপক কুণ্ডু, সহ সাধারণ সম্পাদক কার্তিক মুখার্জি সহ সম্পাদক মানস কুমার রায়, বর্ধমান মডিউল-এর সভাপতি প্রমোদ কুমার, চিফ রিজিওনাল সেক্রেটারি প্রবীর সরখেল প্রমুখ নেতৃত্ব।

ভলিবল ও ফুটবলে একসময়ের দু'জন পারদর্শী খেলোয়াড়

অপূর্ব দাস

খেলার মাঠে পারদর্শিতা দেখিয়ে বর্ধমানের দর্শকদের মন জয় করতে পেরেছেন অনেক খেলোয়াড়। তাদের মধ্যে কৃতী খেলোয়াড় ছিলেন বিষ্ণুদাস তেওয়ারী ও রমেশচন্দ্র দাস। বিষ্ণুদাস তেওয়ারী খেলতেন ভলিবল ও রমেশচন্দ্র দাস খেলতেন ফুটবল। একসময় বর্ধমানের খেলার মাঠকে বর্ণময় করেছেন এই দু'জন খেলোয়াড়। শুধু বর্ধমান নয়, বর্ধমানের বাইরেও ওনাদের খেলার পারদর্শিতার প্রমাণ রয়েছে।

একসময় বর্ধমান শহরের বোরহাটের তরুণ সংঘকে কেন্দ্র করে এই শহরে ভলিবল খেলায় উৎসাহ জাগে। তরুণ সংঘে খেলতেন সেই সময়ের তারকা ভলিবল খেলোয়াড় বিষ্ণুদাস তেওয়ারী ওরফে দনু তেওয়ারী। তাঁর খেলার সুনাম জেলা, রাজ্য, দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও পৌঁছে গিয়েছিল।

প্রকাশিত একটি লেখা থেকে বিষ্ণুদাস তেওয়ারীর খেলা সমন্ধে জানা যায়, সেই সময় জাতীয় পর্যায়ের খেলাকে অলিম্পিক বলা হতো। জাতীয় পর্যায়ের অলিম্পিক দুই বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হতো। ১৯৪০ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত এই জাতীয় অলিম্পিক আয়োজন হয়েছে। বর্ধমান শহরের বোরহাটের বাসিন্দা বিষ্ণুদাস তেওয়ারী রাজ্যদলের অধিনায়ক হয়ে অলিম্পিকে যোগ দিতে বোম্বাই, পাঞ্জাব, দিল্লি, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ, বরোদা, জামসেদপুর ও পাতিয়ালায় গিয়েছেন। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রাজা গোপালাচারির হাত থেকে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পুরস্কার নিয়েছিলেন বিষ্ণুদাস তেওয়ারী। প্রাদেশিক চ্যাম্পিয়ন দলের অধিনায়ক হিসেবে ১৯৫০ সালে রুমানিয়ায় আয়োজিত আন্তর্জাতিক ইউথ ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষে ভারত থেকে যে দল রুমানিয়ায় প্রতিনিধিত্ব করেছিল সেই দলের সহ-অধিনায়ক ছিলেন বিষ্ণুদাস তেওয়ারী। ওনার সঙ্গে বর্ধমানের আরও দু'জন খেলোয়াড় ছিলেন নীহার ব্যানার্জী ও আশুতোষ মিশ্র। নীহার ব্যানার্জী সাপ্লায়ার, আশুতোষ মিশ্র লিফটার এবং বিষ্ণুদাস ছিলেন মাস্টার স্ম্যাসার। ভারতীয় ভলিবল দলের সেটাই ছিল প্রথম বিদেশ সফর। রুমানিয়ায় খেলার পরে সেই দল বুলগেরিয়া, রাশিয়া, বুদাপেস্ট প্রভৃতি দেশে আমন্ত্রণমূলক অংশগ্রহণ করেছিল।

বিষ্ণুদাস তেওয়ারী ১৯৬২ সালে প্রতিযোগিতামূলক খেলা থেকে অবসর নেন। তার আগে তিনি যখন বর্ধমানের মাঠে ভলিবল খেলতেন, তাঁর খেলা দেখার জন্য অনেক দর্শক আসতো। প্রাক্তন ভলিবল খেলোয়াড় তারকনাথ হালদার জানান, সেই সময় বর্ধমান টাউন স্কুল ও বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুল মাঠে ভলিবল টুর্নামেন্টের খেলা হতো। দনুদা-র টিম তরুণ সংঘের বিরুদ্ধে খেলেছে। অসাধারণ খেলোয়াড় ছিলেন দনু তেওয়ারী।

বর্ধমানের ফুটবল মাঠে একসময় তারকা ফুটবলার ছিলেন রমেশ দাস। কলকাতায় খেলে দিল্লি যাওয়ার পথে শ্রীলঙ্কা একাদশ বর্ধমানে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবে। বিদেশি দলের বিরুদ্ধে সেই ফুটবল খেলায় বর্ধমান দলে খেলার জন্য কলকাতা থেকে ডেকে আনা হয়েছে তরুণ একজন ফুটবলারকে। জন্মসূত্রে বর্ধমানের ছেলে হলেও তিনি তখন থাকতেন কলকাতায় এবং সেখানকার ক্লাবে ফুটবল খেলে সুনাম পেতে শুরু করেছেন। ১৯৩৭ সালে বিদেশি দলের বিরুদ্ধে সেই তরুণ ফুটবলারের মুন্সিয়ানায় মুগ্ধ হয়েছিল মাঠের দর্শকরা। সেই তরুণ ফুটবলারটি ছিলেন রমেশচন্দ্র দাস।

১৯৪০ সালে শালবল্লা ও পিচের ড্রাম দিয়ে ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড ঘেরা হয়। টিকিটের দাম হয় দু'পয়সা। রমেশ দাস সেইসময় বর্ধমানের নামি দল আর এ ইউ সি-তে খেলতেন। ১৯৪২ সালে ওয়েস্ট বর্ধমান অ্যাথলেটিক ক্লাব প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠার বছর থেকে ১৯৬৩ সাল অবধি ওয়েস্ট বর্ধমান ক্লাবের কাণ্ডারী হয়ে খেলেছেন রমেশ দাস। তিনি আট বার আইএফএ শিল্ডে বর্ধমানের হয়ে খেলেছেন। অধিনায়ক ছিলেন দু'বার। ১৯৩৮ সালে অবিভক্ত বাংলা দলে প্রতিনিধিত্ব করে তিনি শিলং একাদশের বিরুদ্ধে মাঠে নামেন। তাঁর বাড়ানো বল থেকে বাংলা দল গোল করে। বর্ধমান জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক ছিলেন প্রয়াত আব্দুর রসিদ। তিনি বলেছিলেন, রমেশ দাসের মতো ফুটবলারদের খেলা দেখে দর্শকরা খুশি হতো।

বর্ধমান শহরের রাজবাটির কাছে ভবানী ঠাকুর লেনে রমেশচন্দ্র দাসের বাসস্থান। ২০০৩ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। তখন বয়স হয়েছিলো ৮৪ বছর।

কর্মরত কৃষককে সাপের ছোবল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৮ নভেম্বর : কর্মরত অবস্থায় এক কৃষককে সোমবার সাপের ছোবল খেতে হয়। তাকে উদ্ধার করে প্রথমে মন্তেশ্বর ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। এদিন মন্তেশ্বর থানার পাটকেল ডাঙ্গা গ্রামের কৃষক আসফার শেখ মাঠে সর্ষের বীজ ছড়াচ্ছিলেন। সেই অবস্থায় তাঁর পায়ে বিষধর সাপে ছোবল মারলে তিন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় এখন তাঁর চিকিৎসা চলছে।

প্রান্তজন—আত্মজন (২৮)

রত্না রশীদ

ছোটো থেকেই দেখছি, মানুষ দারিদ্র্যকে আদৌ ভয় পায় না। বাপি রেলচাকুরে বলে রেলের কোয়ার্টারে মোটামুটি সমস্ত স্তরের কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরিরত পরিবারই থাকতো। আর তখন সমাজজীবনে লোক দেখানো আভিজাত্যের নামে এত বিচ্ছিন্নতা-রোগ থাবা গেড়ে বসেনি। পাড়ার সবাই সবার খবর নিত, হ্যাঁ হাঁড়ির খবরই। এখন সবাই এটাকে বদঅভ্যাস বলে দেগে দিয়েছে। কিন্তু কোনোকিছুই শুধু খারাপ হয় না, তার ভালো দিকও তো থাকে।

পাড়ার মধ্যে যদি হঠাৎ কারো কোনো কুটুম এসে পড়লো দুপুরে ভাত খাবার বেলায়, নজরে তো সবারই পড়লো, কারণ লোকের নজর এড়িয়ে পাড়াতে ভালো-মন্দ কারোর কিচ্ছুটি করার সুযোগ ছিল না। ভাব-ভালোবাসার প্রতিবেশী যারা, তারা বিনা তলবেই আঁচলের তলায় বাটিতে করে একটা দুটো পদ লুকিয়ে আড়াল করে এনে যেন কুটুমকে সম্মান করতে এলো—"ও দাদা এতদিন পর বোনকে মনে পড়লো!" বলেই টুক করে একটা প্রণাম ঠুকেই বাড়ি। ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পাবে না যে বাড়িতে দুবাটি তরকারি চলে এলো। তখন তো মোবাইল টাওয়ার বসেনি এদেশে, অন্তরের টানের সুতোয় টান পড়লেই সবাই সবার পাশে যেচে এসে দাঁড়িয়ে যেত। বাড়ির কর্তারা বেশিরভাগ রানিংস্টাফ, হয়তো দু-তিন দিন বাড়ি ফিরতে পারবে না—কোই পরোয়া নেহী—আমরা প্রতিবেশীরা আছি না! বেশিরভাগ চাকুরেই গ্রামাঞ্চল থেকে এসেছে, একান্নবর্তী পরিবার ছেড়ে আসতে হয়েছে চাকরির জন্য, মা-মাসি-কাকী-জ্যেঠির আদর আশ্বাস দেশ বাড়িতে ফেলে এসেছে না বলে বলা ভালো, চোখের জলে বুকের মধ্যে বেঁধে এনেছে। সমমনস্ক মানুষেরা পরবাসে এসে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে আত্মীয় বন্ধনে বাঁধে।

এমনই একদিন ডিউটিতে বেরোবার সময় অনিল কাকুর ডানপিটে ছেলে মুকুলের পা গেল ভেঙে, মুহূর্তে ফুলে ঢোল আর মুকুলের চিল-চিৎকার। ওদিকে কলবুকে কাকু এক ঘন্টা আগে সই করে দিয়েছে। রানিংস্টাফ, ঠিক সময়ে না গেলে অনেক প্যাসেঞ্জারের হয়রানি হবে, নিজে তো শক্ত চার্জশিট খাবেই। মহা সঙ্কট। তুই পড়ে পড়ে যন্ত্রণা ভোগ কর আর কেঁদে চল, আমি ডিউটিতে চললাম—একটা কোনো বাবা বলতে পারে! দিশেহারা কাকু-কাকিমা। পাড়ার লোক জড়ো হয়ে গেছে, বাপিরও সেদিন ছুটি ছিল। বাপি গিয়ে অনিলকাকুকে বললো—তুমি এক্ষুনি ডিউটিতে রওনা হয়ে যাও। আমার আজ ছুটি। আমি মুকুলের দায়িত্ব নিলাম। নিশ্চিন্তে ডিউটি করোগে।

আমাদের রেলের বড়ো হসপিটাল ছিল। চিকিৎসা, ওষুধ, ছোটখাটো অপারেশন, ভাঙা হাড় প্লাস্টার এসব কিছুই বিনা পয়সায় হতো। বড়ো সড়ো কিছু হলে শিয়ালহের বি.আর. সিং হাসপাতাল। তখনকার নামকরা রেলওয়ে চিকিৎসালয়। রেল কর্মীদের চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধে মোটামুটি ভালোই ছিল।

হয়তো বা কোনো বয়স্ক মানুষের খুব জ্বর-জ্বারি হয়েছে। পাড়ার প্রত্যেকে তাকে দেখতে যাবে। সবাই যে হাতে করে ফল-টল নিয়ে যেতো রুগীর জন্য, তা একদমই না। তবু কাছে গিয়ে বসতো, মাথায়-গায়ে-পায়ে হাত বুলিয়ে দিতো। বুড়ি ঠাকুমাটা হয়তো চুপি চুপি কাউকে বলতো, আমায় একটু পোস্তর বড়া খাওয়াবে, মা? যাকে বলতো, সে পড়তো মহা ফাঁপড়ে। পোস্তর পড়া একদিন খাওয়ানোই যায়—কিন্তু ঠাকুমার বৌমা বিরক্ত হতে পারে। ভেবে নিতে পারে যে শাশুড়ি কাউকে নালিশ করেছে। তো, সেই কথা একান-ওকান হতে হতে আমার দিদার কানে এলো। ঠিক তার পরের দিনই নয়, তিনচার দিন বাদে আমার দিদা গেলো গোটাকতক পোস্তর বড়া বাটিতে করে নিয়ে লুকিয়ে। দিদা তো এর আগে যায়নি, দিদাকে সন্দেহ তালিকায় তাই রাখতেও পারবে না কেউ। এমনিতেই দিদাকে সবাই খুব সম্মান করতো। দিদা গিয়ে সটান কাকিমার হাতে দিয়ে বললো—বৌমা, আজ পোস্তর বড়া করেছিলাম। তুমি তো জানো, নারায়ণকে নিবেদন না করে আমি অন্নগ্রহণ করে না। তো, আজ খেতে বসার আগে তোমার শাশুড়িমায়ের জন্য মন কেমন করে উঠলো—আহা কতদিন পড়ে আছে বিছানায়। তোমরাও খেয়ো। একটা পোস্তর বড়া তোমার শাশুড়িমাকে খাইয়ে দাও না মা, আমি একটু ওর কাছে গিয়ে বসছি।

তারপর রুগীঠাকুমা আর আমার দিদা গল্পগাছা করতে লাগলো। এর মধ্যেই কাকিমা রুগী ঠাকুমাকে পোস্তর বড়া খাইয়ে গেল—নিন মা, আপনার এই বন্ধু এনেছেন আমাদের সবার জন্যে। নারায়ণকে নিবেদন করা প্রসাদ বলে মুখে দিন।

রুগ্ন ক্লান্ত ঝাপসা চোখ জুড়ে কী যে আহ্লাদের আলো জ্বলে উঠলো রুগী ঠাকুমার চোখে, তা বর্ণনায় কুলোবে না।

(চলবে)

ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রদের কনভেনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১২ নভেম্বর : পেশাগতভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রদের নিয়ে শুক্রবার কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের পূর্বস্থলী লোকাল কমিটির টেকনিক্যাল সাব কমিটির এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় নাদনঘাট মোড়ের মার্কসীয় গ্রন্থাগারে। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন কনভেনশনের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে কৌশিক সরকার। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন আকাশ মণ্ডল। কনভেনশন থেকে রনি কোলেকে কনভেনর ও আকাশ মণ্ডলকে কো-কনভেনর করে ১০ জনের কমিটি গঠন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন লোকাল কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দিব্যেন্দু নন্দী, লোকাল কমিটির সম্পাদক সৃজন বসাক প্রমুখ।

পর পর চুরি ও ধর্ষণের ঘটনায় জেলার মানুষ আতঙ্কে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১২ নভেম্বর : একমাসের মধ্যে জেলায় চারটি ধর্ষণ ও পুড়িয়ে খুন, তালাভেঙে বাড়ির সর্বস্ব লুট, এবং একাধিক ছিনতাই-এর ঘটনা ঘটল। কোনটিরও কিনারা করতে পারেনি পুলিশ। এতেই আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন মানুষ।

কাঞ্চননগরে, ভাতারে, সদরে ও সবশেষে জামালপুরে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে খুনের ঘটনাগুলি ঘটে। সবকটি ধর্ষিতা যুবতীকে বাইরে থেকে এনে খুন করা হয়। এখনো পর্যন্ত ধর্ষিতাদের সনাক্তকরণের কাজ সেরে উঠতে পারেনি পুলিশ। সিসি টিভি থাকলেও কাঞ্চননগরে পুলিশ কেন দুষ্কৃতীদের ধরতে পারছে না তা নিয়ে ক্ষুব্ধ শহরবাসী।

এদিকে শহরে তালাভেঙে চুরির একাধিক ঘটনায় মানুষ আতঙ্কে। তাছাড়া, গত ২৭ অক্টোবর একলক্ষী গ্রামে সোনার দোকানে ডাকাতি, ২৮ অক্টোবর গলসিতে সোনার দোকানে চুরি—সবটাই ভাবাচ্ছে পুলিশকে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, কম্বল বিক্রির নামে রাস্তা ও বাড়ি রেইকি করে যাচ্ছে।

এছাড়া গত ১৩ নভেম্বর রেনেশাঁ উপনগরীর বাসিন্দারা বিক্ষোভ-আন্দোলন করে 'শ্রাচী' দপ্তরে। পরপর কয়েকদিন ধরে এলাকায় তালা ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটছে। এব্যাপারে থানা ও 'শ্রাচী' দপ্তরে জানালেও কোনো কিনারা হয়নি। থানা ও শ্রাচী একে অপরকে দোষারোপ করে চলেছে।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়। *-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি*

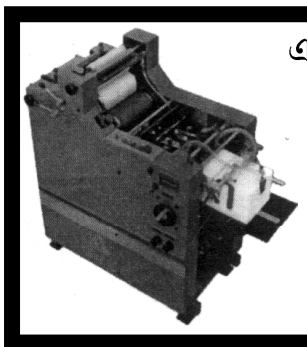

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

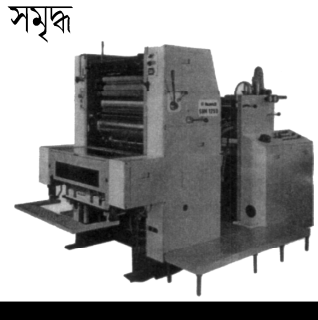

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা